ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1327-1338
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

কমলকুমার মজুমদারের কথাসাহিত্যে ভাষা, মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক দ্বন্দ্ব: একটি বিশ্লেষণমূলক পাঠ

সাদিয়া আফরিন, *পিএইচডি গবেষক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব), বাংলাদেশ*

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kamalkumar Majumdar stands as one of the most radical and boundary-breaking writers in Bangla literature. This paper offers a critical exploration of his distinct narrative style, psychological depth, and philosophical complexity. Through the analysis of selected short stories such as Lal Juto, Madhu, Jol, Teish, Mallika Bahar, and Motilal Padri, the study reveals how Majumdar intricately weaves themes of love, sexuality, identity, social inequality, and the layered sorrows of marginalized lives. His writings reflect significant traces of Freudian libido theory, Judith Butler's notion of gender performativity, and existential inquiry. Majumdar's language oscillates between the poetic and abstract, and the earthy and colloquial; making language itself an aesthetic entity that provokes thought, conflict, and introspection in the reader. His portrayal of female psychology and social positioning particularly marks him as a subversive and singular voice within Bangla fiction. This research establishes that Majumdar's literary achievement lies not only in thematic richness but also in his innovative linguistic architecture and intellectual modernity. His stories are not merely texts to be read, but spaces for deep contemplation.

Keywords: Kamalkumar Majumdar, Bengali Short Fiction, Narrative Language, Gender Performativity, Freud's Libido Theory, Literary Modernism

বাংলা সাহিত্যের দুরূহতম লেখক হিসেবে খ্যাত কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) আজীবন নিরলসভাবে সরল হতে চেয়েছেন। তাঁর এই সরল ও জটিলতার দ্বন্দ্বময় মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর সাহিত্যকর্মে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় দ্যোতনার সৃষ্টি হয়েছে। গূঢ়ার্থবাহী লিখনশৈলীর মাধ্যমে তিনি বিচিত্র বিষয় ও মৌলিক উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বিস্ময় ও আনন্দের বিচিত্র প্রকাশ তিনি অবিরতভাবে আবিষ্কার করেছেন। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাই এক গভীর অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধান, যেখানে মানুষের চেতনা, অবচেতনা, যৌনতা, আত্মদ্বন্দ্ব, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার বহুমাত্রিক দ্যোতনা একাকার হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষা ও আখ্যানরীতিতে যেমন রয়েছে চিত্ররূপময়তা, তেমনি রয়েছে দার্শনিক ব্যঞ্জনা। তিনি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছেন- “কে আমি?”, “আমার অস্তিত্বের তাৎপর্য কী?”, “এই সমাজ ও সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়?”- এই নিরন্তর অনুসন্ধান তাঁকে এক বিশুদ্ধ আত্মসন্ধানী শিল্পীতে রূপান্তরিত করেছে। তাঁর রচিত ছোটগল্পসমূহ, যেমন: লাল জুতো, মধু, জল, তেইশ, মল্লিকা বাহার, মতিলাল পাদরী; এসব গল্প বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং ভাষাগত নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর শিল্প-সচেতনতার অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। এই গল্পগুলোর প্রতিটিতেই বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে রয়েছে চমকপ্রদ গভীরতা ও ব্যঞ্জনা।

কমলকুমারের ভাষার চিত্রণ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন-

> "কমলবাবু একজন আর্টিস্ট, কমপ্লিট আর্টিস্ট। ক্যামেরা-তুলি চালিয়ে উনি ভাষায় চিত্র আঁকেন।"[১]

সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি পর্যবেক্ষণও প্রণিধানযোগ্য:

> "আর্টের কথা বলতে গিয়ে তাঁর জ্ঞানের বাইরেও যে জিনিসটা মুগ্ধ করত, সেটা হল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আপাততুচ্ছ দৃশ্যের মধ্য থেকেও তিনি যেসব ডিটেল আহরণ করতেন, সেটা পরে তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল, তা ছিল বিস্ময়কর।"[২]

এই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিই কমলকুমার মজুমদারকে অন্য কথাসাহিত্যিকদের তুলনায় অনন্য করে তোলে। তিনি সমাজ, মানুষ এবং ব্যক্তিচরিত্রকে নির্মোহভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সে নির্মাণে কোনো আবেগাত্মক ভাবুকতা বা অতিনাটকীয়তা স্থান পায়নি। তিনি যেভাবে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন, সেই বাস্তবতাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতেও ছিলেন সমান নিপুণ। তাঁর অভিজ্ঞতার জুগুপ্সাময়তাকে যখন তিনি বাচনিক শিল্পে রূপান্তর করেন, তখন তাঁর ভাষায় গড়ে ওঠে এক নিজস্ব নন্দনের বলয়। তিনি কখনো নিছক পাঠককে আনন্দ দেওয়ার জন্য লেখেননি। বরং তাঁর লেখনীতে ছিল দহন, ক্ষোভ ও তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে দার্শনিক নীৎশের উক্তি- 'I write with my blood'- উল্লেখ করা যেতে পারে। কমলকুমারও ঠিক তেমনই চান, পাঠক তাঁর লেখায় নান্দনিকতা ও চিন্তাশীলতা উভয়ই অনুভব করুক; শুধু উপভোগ নয়, বরং তারা যেন বিব্রত, বিচলিত ও উত্যক্ত হয়। তাঁর ছোটগল্প রচনার সূচনালগ্নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হলো, '*লাল জুতো*' ও '*মধু*'। এর মধ্যে '*লাল জুতো*' গল্পটিকে তিনি নিজেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে। এই দুটি গল্পে আমরা কমলকুমারের রোমান্টিক ভাবনার দুটি ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করি; যেখানে আবেগ ও আত্মদ্বন্দ্ব, কামনা ও নিষ্ঠা, ভাষা ও অভিজ্ঞতা একে অপরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে।

'লাল জুতো' গল্পটিতে কিশোর-কিশোরী গৌরী ও নীতীশের হৃদয়ের গভীরে নিহিত রক্তিম আকর্ষণ ও বাসনাকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। এই লাল জুতো যেন হয়ে ওঠে অন্তরের মধ্যে সুপ্ত থাকা সেই দুটি ঘুমন্ত পা, যার একটিতে প্রতিফলিত হয় নীতীশের পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্যটিতে গৌরীর মাতৃত্বের চিরন্তন বোধ। দুই কিশোর-কিশোরী, যারা ক্ষণিক অভিমানে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, আবার সহজেই ফিরে আসে; তাদের মানসিকতার এই অপরিণত প্রকাশের মধ্যেও লেখক আবিষ্কার করেন এক শাশ্বত মানবিক অনুভব। সেই অনুভব, যা প্রেমের অনিবার্য ভবিষ্যৎ এবং আত্মপরিচয়ের মোহিনী শক্তিকে স্পর্শ করে। তাঁদের মনে যেন এই লাল জুতোই হয়ে ওঠে আগামীর ভবিষ্যতের প্রতীক। এই প্রেম কোনো রোমান্টিক কল্পনাজাত নয়, বরং এক বাস্তবতাজাত প্রেরণা, যা জন্ম দেয় নতুন জীবনের সম্ভাবনা, একটি অনাগত অস্তিত্বের স্বপ্ন।

গল্পে বর্ণিত হয়েছে:

> "... মনে হল, এ যেন তারই শিশুর জুতো! তার দেহ আনন্দে শিথিল হয়ে আসছিল। যেন কোনো রমণীয় সুখ অনুভব করে... সবকিছু যেন আজ পূর্ণ হল। নিজেদের কল্পনায় যে সুন্দর ছিল, যেন তাকেই রূপ দেবার জন্য দুজনে আবদ্ধ হল।"[৩]

এই উক্তিতে একদিকে রয়েছে প্রেমের আনন্দময়তা, অপরদিকে রয়েছে পিতৃত্ব-মাতৃত্বের গভীর অচেতন আকাঙ্ক্ষা। লেখক যেন প্রেমের প্রাথমিক বোধের ভেতরেই ভবিষ্যতের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নর-নারীর প্রেমের বহু চিত্র থাকলেও, এমনভাবে কিশোর মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে মাতৃত্ব-পিতৃত্বের চৈতন্য নির্মাণ এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

নীতীশের এই 'পিতা হবার বাসনা' এবং গৌরীর মাতৃত্ববোধ সম্ভবত লেখকের নিজের জীবনেরই কোনো গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিফলন। ভাষার বিচারে এই গল্পে কমলকুমার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। মনোজগতের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে তিনি পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। যখন তিনি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেন, তখন বাক্য হয়ে ওঠে দীর্ঘ, ধ্যানমগ্ন, প্রায় কাব্যিক:

> "আনন্দে বিস্ফোরিত আঁখিযুগল। নিজেকে যেন অনুভব করলে। আজ শান্ত হল তার লক্ষ বাসনা লক্ষ বেদনা-লক্ষ স্বপ্ন মূর্তি পেল। বিশ্বগত অপূর্ণতা তারা এই তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করলে; পূর্ণতার সম্ভবনায় দুজনেই মহা-আনন্দ-মদে মত্ত হয়ে উঠল।"[৪]

এই অংশে কমলকুমার যেন কিশোর-কিশোরীর স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই মানবজাতির মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রেরণাকে ব্যক্ত করেছেন। সংলাপে তিনি ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন, যা চরিত্রের বয়স, অবস্থা ও আবেগকে সার্থকভাবে ধারণ করে:

> "কার জন্যে গো?
> মৃদু হেসে বললে, তোমার জন্যে!
> বারে তুমি যেন কি! অতটুকু জুতো, আমার পায় কখনও হয়?"[৫]

এই সংলাপগুলোতে সহজতার সঙ্গে নির্মিত হয়েছে প্রেম, অভিমান ও অনাবিল আন্তরিকতা। কমলকুমার তাঁর ভাষাকে ধারাবাহিকভাবে রূপান্তর করেছেন। তাইতো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন:

> "কমলকুমারের মতন দুঃসাহসী লেখক আমরা বাংলা ভাষায় আর দেখিনি, তিনি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে নিয়েছেন।"[৬]

'লাল জুতো' একটি রূপক গল্প হলেও এর অভ্যন্তরে রয়েছে নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা, যা পাঠককে টানে অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নের দিকে, যেমন: প্রেম, পরিচয় ও সৃষ্টিশীলতার অন্তর্লীন টানাপোড়েনে। তাছাড়াও এই গল্পটি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব (Libido Theory) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। মানবজীবনের সমস্ত মানসিক বিকাশ ও আচরণকে যৌন-শক্তি বা কামনা-চেতনার (libido) বিকাশ ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে। তাঁর মতে, লিবিডো হলো একধরনের মানসিক শক্তি, যা মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টিশীলতা, প্রেম, মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ইত্যাদি সব মানবীয় অনুভবকে চালনা করে। কমলকুমার মজুমদারের *'লাল জুতো'* গল্পটিকে আমরা যদি এই তত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা করি, তাহলে দেখা যায়, গল্পটি কেবল কিশোর প্রেম নয়, বরং এটি এক কামনা-চেতনাভিত্তিক বিকাশমান সত্তার গল্প, যেখানে লিবিডোর শক্তি যৌনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শে রূপান্তরিত হয়।

গল্পের নায়ক নীতীশ যখন গৌরীর জন্য ছোট একটি লাল জুতো কেনে এবং সেটিকে নিজের সন্তানের জুতো বলে কল্পনা করে, তখন সে আসলে চেতন ও অবচেতনের মাঝামাঝি একটি স্তরে পৌঁছায়; যেখানে যৌন লিবিডো রূপান্তরিত হচ্ছে পিতৃত্বের সৃষ্টিশীল অভিপ্রায়-এ। এই রূপান্তর ফ্রয়েডের ভাষায় সাব্লিমেশন (sublimation)- যেখানে যৌন লিবিডো সমাজগ্রাহ্য ও সৃষ্টিশীল প্রেক্ষিতে রূপ নেয়।

> "এ যেন তারই শিশুর জুতো!... সবকিছু যেন আজ পূর্ণ হল।"[৭]

এই উক্তি স্পষ্ট করে দেয়, যৌন কামনা এখানে আর শরীরী চাহিদায় সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা আত্মিক ও ভবিষ্যতধর্মী, এক পিতৃত্বের আত্মতৃপ্তি হয়ে উঠেছে। ফ্রয়েডীয় লিবিডো তত্ত্ব অনুযায়ী, এই পর্যায়কে বলা যায় জেনিটাল স্টেজ (genital stage), যেখানে যৌন শক্তি প্রজনন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্বে রূপান্তরিত হয়। গৌরী, যে কিনা একজন কিশোরী, সে-ও জুতোটি দেখে এক ধরনের আবেগময় তৃপ্তি অনুভব করে। যদিও সে সরাসরি মাতৃত্বের কথা বলেনি, কিন্তু তার হাসি, সংকোচ ও আত্মরতির মধ্যে এক ধরনের আন্তর্নিহিত নারীত্বের প্রকাশ ঘটে, যা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে নারীর লিবিডো-চেতনার জাগরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই সম্পর্কটি কিশোর-কিশোরী হলেও তারা কল্পনায় নিজেদের পিতা-মাতা রূপে ভাবতে শুরু করে। ফলে এখানে আমরা 'লাল জুতো'কে কেবল প্রেমের উপহার নয়, বরং একটি লিবিডোর প্রতীক হিসেবে দেখতে পারি, যা যৌনতাকে অতিক্রম করে এক প্রজনন-সচেতন ভবিষ্যতের কল্পনায় উপনীত হয়েছে।

তাছাড়া 'লাল' রঙ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে একটি শক্তিশালী চেতন ও অবচেতনের সংযোগচিহ্ন। এটি উত্তাপ, কামনা, রক্ত, জীবন ও যৌনতার রঙ। লাল জুতো তাই কেবল একটি অলংকার নয়; এটি এক ধরনের সাইকো-সেক্সুয়াল প্রতীক যা চরিত্রদের মনোজগতে সঞ্চারিত লিবিডোর ছায়াচিত্র বহন করে। ফ্রয়েড বলেন, মানবচেতনার শ্রেষ্ঠ রূপ হলো সাব্লিমেশন, যেখানে মানুষ তার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে সমাজ-গ্রাহ্য ও সৃজনশীল লক্ষ্যে পরিণত করে। 'লাল জুতো' গল্পে আমরা দেখি, কিশোর বয়সের প্রেম এখানে শুধু রোমান্টিক সম্পর্ক নয়, বরং একটি সৃজনপ্রক্রিয়ার কল্পনা, একটি ভবিষ্যত সন্তানের ছবি। এই ধরনের মানসিক পরিপক্বতা ফ্রয়েডীয় লিবিডো তত্ত্বের শেষ স্তরকে নির্দেশ করে।

> "বিশ্বগত অপূর্ণতা তারা এই তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করলে; পূর্ণতার সম্ভবনায় দুজনেই মহা-আনন্দ-মদে মত্ত হয়ে উঠল।"[৮]

এখানে 'পূর্ণতা' বলতে বোঝায় তাদের কামনা-চেতনার এক পরিণত রূপ, যেখানে দেহজ বাসনা পরিণত হয়েছে আত্মিক সৃষ্টি ও মানবিক ভবিষ্যতের কল্পনায়। ফ্রয়েডীয় লিবিডো তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, 'লাল জুতো' একটি অনন্য গল্প, যেখানে কিশোর প্রেমের পেছনে নিহিত আছে যৌনচেতনা, অবচেতন কামনা, মাতৃত্ব-পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টিশীল রূপান্তরের শক্তি। কমলকুমার এখানে শরীরী প্রেম নয়, বরং চেতন ও অবচেতন সত্তার মিলনের মধ্য দিয়ে মানবীয় কামনার এক নিটোল রূপ নির্মাণ করেছেন। এই গল্পে লিবিডো কখনো প্রেমের রূপে, কখনো জুতোয়ের প্রতীকে, আবার কখনো ভবিষ্যতের সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত থেকে আমাদের জানান দেয়, মানব জীবন আসলে এক গভীর, বহুস্তরীয় কামনা-চেতনার মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস।

কমলকুমার মজুমদার তাঁর গল্প '*মধু*'-তে প্রেমের আরেকটি দিক উন্মোচন করেছেন, যেখানে বাস্তবতা ও রোমান্টিসিজমের এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি এমন একটি চরিত্র গঠন করেছেন, যিনি নিঃসঙ্গতা ও রোমান্টিক চিন্তার জগতে বাস করেন, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে জোরপূর্বক মিশতে বাধ্য। কলাবতীর জীবনযাত্রার বাস্তবতা তাকে আকৃষ্ট করেছে, কারণ সে তার স্বপ্নময় অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, অন্য কেউকে তার চোখে দেখার চেষ্টা করে নিজেকে বুঝতে চায়। লেখকের রোমান্টিকতার প্রতি শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা অতিরঞ্জিত রোমান্টিক ভাবনাকে আশ্রয় করে, অথচ তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে। কারণ, গ্রামীণ অর্থনীতির ভেঙ্গে পড়ার ফলে শহরে এসে কলাবতীর মতো নারীরা শোষণের শিকার হন; তাদের সৌন্দর্য এবং শ্রম দেখে স্বামীরা সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে ছেড়ে চলে যান, বা অবমূল্যায়িত করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন।

কমলকুমার এখানে এক আধুনিক 'যন্ত্রযুগের' দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন, যেখানে একপক্ষে মানুষ ক্রমাগত অমানবিকতার শিকার, অন্যদিকে কেউ রোমান্টিক স্বপ্নের আলোকে ঘেরা। কিন্তু সেই স্বপ্নের মায়া একদিন ভেঙে যায়, আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্য কেউ। যেমন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের উপলব্ধি থেকে স্পষ্ট:

> "তারপর বুঝলাম আমি সময় মানিনি- আর একদিন, ওদের পথের পথিক হবো ভেবে ছেঁড়া জামা পরেছিলাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কলাবতীকে বললাম- দেশে যাও।"[৯]

এই বক্তব্যটি যেন Baudelaire-এর *disenchantment* বা নগরজীবনের ক্লান্তিকর বোধের প্রতিধ্বনি। এই গল্পের মাধ্যমে কমলকুমার প্রেমের একটি জটিল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি পরীক্ষা করেছেন প্রেম কি শ্রেণি, সংস্কার, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ অতিক্রম করে বাস্তবে সম্ভব? গল্পে দেখা যায়, প্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তির অন্তর্গত অনুভূতি নয়, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সমাজকে নয়, বরং ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন। চারপাশের সব বাধা ভেঙে নতুন অন্তর্দৃষ্টির জন্ম দিয়েছেন। গল্পের ভাষায় কমলকুমার সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাকে জুড়ে দিয়েছেন, যা সংলাপগুলোকে স্বচ্ছ, সরল ও কোমল করে তোলে, আবার বর্ণনার বিশালতাও ধরে রাখে। যখন গল্পকথক রাতে কলাবতীর বাড়িতে যায়, তাদের অন্তর্গত সংলাপগুলো খুবই সহজ অথচ অর্থবহ:

> "বললে- এত রাতে!
> ক্ষমা করো।
> হেঁসে বললে- অর্থাৎ আমার উচিত হয়নি এত রাতে আসা।"[১০]

'মধু' গল্পের এই বাস্তবধর্মী প্রেমের চিত্রন কমলকুমারের অন্যান্য গল্পের মতোই একধরনের সমাজবিজ্ঞানের সমীক্ষা এবং মানবচেতনার গভীর অনুসন্ধান। *'মধু'* গল্পের পর কমলকুমার মজুমদার তার স্বকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে এক বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি হন। বিশেষ করে *'জল'* ও *'তেইশ'* গল্পদুটিতে তাঁর লেখায় সমাজচিন্তার বিস্তৃতি ও গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দুই গল্পে তিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, ক্ষমতা কাঠামোর বৈষম্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন এক তীব্র বেদনার চিত্ররূপে।

'জল' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, ক্ষুধার কোনো সম্প্রদায় থাকে না। চূড়ান্ত দারিদ্র্য, অসহায়তা ও ক্ষুধার দহন মানুষকে বাধ্য করে নৈতিকতা ও মানবতাকে পাশ কাটিয়ে জীবনসংগ্রামের নির্মমতায় প্রবেশ করতে। গল্পের প্রধান চরিত্র ফজলের মধ্যে আমরা শুরুতে এক ধর্মপ্রাণ, নিষ্কলুষ, নীতিনিষ্ঠ মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই:

> "পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভালো লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুনেনি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটিনা, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।"[১১]

এই আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণে ফজলের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু ক্রমে সেই আদর্শিক অবস্থান বিপর্যস্ত হয়। ক্ষুধা ও অস্তিত্বের লড়াইয়ে ফজলের বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, সে আর নিজেকে ফজল বলে পরিচিত করায় না- সে হয়ে ওঠে কানাই, একজন অপরিচিত ও অবক্ষয়িত মানুষ:

> "সে কানাই সে কানাই- ফজল নয়।"[১২]

এই পরিবর্তন কেবল নামের নয়, এটা এক সামাজিক ও অস্তিত্বগত বিপর্যয়ের প্রতীক। যে ফজল একসময় 'ভালো লোক' হতে চেয়েছিল, সে-ই এক পর্যায়ে ক্ষুধার তাড়নায় মাকে হত্যা করে, বোনকে তুলে দিতে চায় নন্দ খুড়োর হাতে, দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্ম, আত্মসংযম, এবং পারিবারিক মূল্যবোধ সবকিছুই এখানে অবলীলায় বিলুপ্ত হয় এক দারিদ্র্যকবলিত বাস্তবতায়। কমলকুমার এখানে কেবল গল্প বলেননি, দেখিয়েছেন একটি সমাজ কাঠামোর ভাঙন, দেখিয়েছেন কীভাবে একটি অমানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একজন 'ভাল লোক'কেও ধ্বংস করে ফেলতে পারে। 'জল' গল্পে 'ফজল হয় ভাল লোক'-এই বাক্যটি বারবার ফিরে আসে, যেন এক প্রতিধ্বনি, যা শেষ পর্যন্ত এক নির্মম ব্যঙ্গ হয়ে ওঠে। লেখক এই বাক্যটিকে আলাদাভাবে আলোকিত করেছেন, ফর্ম ও বক্তব্যের দ্বৈত কৌশলের মধ্য দিয়ে। এই দারিদ্র্যকবলিত বাস্তবতায় ধর্ম, নৈতিকতা কিংবা আত্মমর্যাদাবোধও অস্তিত্ব সংকটের মুখে টিকতে পারে না; এটাই কমলকুমারের নির্মম কিন্তু সত্য উপলব্ধি। এখানেই তিনি এক মানবিক জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন: আমরা কেউই তো মন্দ হতে চাই না, কিন্তু সমাজব্যবস্থার চাপ মানুষকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করায়?

এই সংকটময় বাস্তবতার নান্দনিক বর্ণনায় সহমর্মিতা ও বেদনা, দুটিকেই একত্রে ধারণ করেছেন লেখক। এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য:

> "কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসে ঘটনার যুক্তিহীনতার কোনো প্রশ্রয় নাই। ঘটনাক্রমের যুক্তি-শৃঙ্খলায় সেখানে কোনো দুর্বল সন্ধি থাকে না। গল্প নির্মাতা অলঙ্ঘ্য নিয়মের শাসন তিনি যে মেনে নেন, তাতেই প্রমাণ তাঁর রচনা স্বাধীন বিলাস মাত্র নয়।"[১৩]

'জল' গল্পে ভূমি ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, ধর্ম ও অর্থনীতির পুঞ্জীভূত সংকটে যে ফাঁপা শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা ফজলের অন্তর্জগতে এক বিভ্রান্তিকর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'বামুন হয় কলির বামুন'-এই কথার প্রতিবিম্বেই 'ফজল হয় ভাল লোক' বাক্যটি যেন তিক্ত ব্যঙ্গ হয়ে ওঠে। গল্পটি শেষ হয় চরম মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে, যা কমলকুমারের সমাজমনস্ক রচনার অন্যতম শীর্ষবিন্দু।

কমলকুমার মজুমদারের *'তেইশ'* গল্পটি গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের নিপীড়িত বাস্তবতার এক নির্দয় দলিল। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে শোষণ ও বৈষম্যের এক নির্মম চিত্র; যেখানে জমিদার শ্রেণির ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের ফলে কৃষকসমাজ বারবার ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। টুলটুলীর জমিদার কোনো পরোয়ানা ছাড়াই চাষরত অবস্থায় আলমের জমি নিলাম করে নেয়, এই ঘটনাটি কেবল একক নিপীড়নের ঘটনা নয়, বরং ভূস্বামীকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিতরকার বৈষম্য ও শোষণের প্রতীক। গল্পে লেখক পরিহাস ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে এই বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন-

> "বাবুরা সজ্জন; তারা একটা টীউবওয়েল করে দিয়েছেন।"[১৪]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রজার অর্থে নির্মিত জনকল্যাণ প্রকল্পের পেছনে জমিদার শ্রেণির নিজেদের মহান ভাবার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। একদিকে প্রজার সর্বনাশ, অন্যদিকে বাবুদের দয়াবান সাজার প্রচেষ্টা; এই দ্বৈততা গল্পের রাজনৈতিক অন্তর্নিহিততাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই গল্পে বারবার 'ক্ষেপে ওঠা' কথাটি উচ্চারিত হয়, যা প্রতিবাদের সম্ভাব্য ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু কমলবাবু এখানে বাস্তব বিপ্লব বা সংঘটনের কোনো রোমান্টিক চিত্র আঁকেননি; বরং দেখিয়েছেন, এই ক্ষোভ বা বিক্ষোভের কোনো সংগঠিত রূপ গড়ে উঠতে পারে না, কারণ- "আমরা যে বড় একা রে।"[১৫] লেখকের এই বচনে ফুটে ওঠে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক আস্থার ঘাটতি এবং সংগ্রামের অক্ষমতা। এটি বিপ্লববাদের প্রতীতির থেকে একধরনের নিঃসঙ্গ মানবিক বোধকে তুলে ধরে। এদিক থেকে

কমলবাবু বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায়, যিনি তাঁর লেখায় বিপ্লবের প্রত্যাশা ও সংগ্রামের কল্পনা তুলে ধরেছেন।

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের সর্বনাশের চূড়ান্ত রূপ, যা কেবল আর্থিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিকও বটে। জমি হারিয়ে আলম নিজের চোখ অন্ধ করে ফেলে যাতে ভিক্ষে পাওয়া সহজ হয়, আর তার স্ত্রী এতে খুশি হয়। গল্পের এই পরিণতি পাঠকের মনে এক মর্মান্তিক বিস্ফোরণ ঘটায়। সমাজব্যবস্থার নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় পাঠককে। শেষের সংলাপটি-

> "এবার ভিক্কে মিলবে রে, আমি ডুমনীর ওষুদ খেয়েছি- জমি গেছে তাতে কি- খাবার আর ভাবনা নেই- ভিক্কে পাবরে আমার উপর সবার দয়া হবে রে-... বউ খুসী হয়েছিল।"[১৬]

এই অংশে ফুটে ওঠে ব্যক্তি ও সমাজের মূল্যবোধের চূড়ান্ত অধঃপতন। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান মন্তব্যে '*তেইশ*' গল্পের অন্তর্নিহিত দার্শনিক গভীরতা স্পষ্ট হয়-

> "কমলবাবুই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি বিশ শতকের আধুনিকতাকে জেরা করেছেন আদিমতা এবং প্রাচীন সভ্যতার সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাকে।"[১৭]

কমলকুমার আধুনিকতার মোহ ভাঙিয়ে পাঠককে সমাজ ও সভ্যতার একটি আদিম, নির্মম চেহারার দিকে তাকাতে বাধ্য করেন। তার ভাষা ও পুনরুক্তির কৌশল, যেমন 'বাবুরা সজ্জন', 'চল ক্ষেপে উঠি', 'সবাই আমরা বড্ড একা'- এই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তিনি একটি ব্যঞ্জনাময় দ্যোতনা, সংঘর্ষ ও আবেগসঞ্জাত দোলাচল সৃষ্টি করেন। *'তেইশ'* গল্পে জমিদারি শোষণ ও প্রান্তিক কৃষকের নিঃস্বতার ট্র্যাজেডি ভাষার প্রতিটি স্তর জুড়ে ব্যঞ্জনাময়ভাবে উদ্ভাসিত। 'চল ক্ষেপে উঠি' অথবা 'আমরা বড় একা'-এই পুনরুক্ত বাক্যভঙ্গি Eliot-এর 'ritualistic repetition'-এর মতো এক মর্মান্তিক আবর্তন সৃষ্টি করে, যা অস্তিত্বগত অসহায়তার প্রতিচিত্র।

সবশেষে বলা যায়, *'তেইশ'* কেবল একটি গল্প নয়, এটি একটি মানসিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি। সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম, নিঃসঙ্গতা, শোষণ এবং সম্ভাব্য প্রতিবাদের নিষ্ফলতা কমলবাবু যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। *'মধু'* ও '*লাল জুতো*'র মতো প্রারম্ভিক গল্পগুলোর তুলনায় *'জল'* ও '*তেইশ*' গল্পে কমলকুমার মজুমদারের ভাষাশৈলীতে এক দৃশ্যমান রূপান্তর লক্ষ করা যায়। এখানকার ভাষা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রতীকী, ব্যঞ্জনাময় ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাসম্পন্ন। এই ভাষার মাধ্যমে তিনি শুধু গল্প বলেন না, বরং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থান, বেদনা, বিচ্ছিন্নতা এবং অন্তর্মুখী প্রতিবাদকে প্রকাশ করেন। পরাজয়ের বোধ, ক্ষিপ্র বিক্ষোভের নিষ্ফলতা, এবং 'ভালো মানুষ' হয়ে বেঁচে থাকার অর্থহীনতা; এসব বোধ যেন ভাষার স্তরে স্তরে নির্মিত হয়। কমলবাবু শব্দকে ব্যবহার করেন দ্বিমাত্রিকভাবে, একদিকে শব্দের বহিরাঙ্গিক অর্থ, অপরদিকে অন্তর্লীন ভাবগত প্রতিক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে আলোক সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

> "কমলকুমারের ভাষার জটিল অন্বয় ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।"[১৮]

এই জটিলতা কৃত্রিম নয়; বরং এক অভ্যন্তরীণ সৃজনপ্রক্রিয়ার ফল। তাঁর ভাষা বাংলা ভাষার প্রচলিত বাক্যগঠনের সীমা অতিক্রম করে ইংরেজি বাক্যরীতির অনুসরণে গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যভাষার 'ভদ্রলোক সংস্করণ'-কে অস্বীকার করে তিনি জনজীবনের মৌখিক, খাপছাড়া, অনেক সময় অশ্লীল, অথচ বাস্তব ও জ্যান্ত শব্দভাণ্ডারকে সাহিত্যে স্থান দেন। *'জল'* গল্পে আমরা দেখি, বাইবেলের অনুবাদে ব্যবহৃত অনুপযুক্ত ক্রিয়াপদের মতো বাক্যরচনা:

> "ফজল হয় ভালো লোক, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন।"[১৯]

এখানে 'হয়' ক্রিয়াপদের ব্যবহার কেবল ব্যাকরণগতভাবে ব্যতিক্রমী নয়, বরং চরিত্রের বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ এবং ধর্মীয় নিয়তিকে কবুল করার একটি মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিত বহন করে। *'তেইশ'* গল্পের নামকরণও যথার্থভাবে দ্যোতনাময়। এটি কেবল আলমের বয়স নয়, বরং ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতির নির্মমতা এবং জীবনের অপূর্ণতার প্রতীক; একটি বয়স যেখানে জীবন শুরু হবার কথা, অথচ সেখানে ঘটে জীবনের বিসর্জন। এই গল্পে কমলবাবু লোকজ ভাষার বহুমাত্রিক রূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন:

"ঢং করবার জায়গা পেলে না শালা ভূত, মরতে হয় নদীতে ঢুবে মরগে যা পাজী!"[২০]

এই ধরনের বাক্য শুধু চরিত্রের লোকজ উচ্চারণ নয়, বরং ভাষার মধ্য দিয়ে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষোভ, হতাশা ও নিরুপায় অবস্থানও প্রকাশ পায়। এটি লোকভাষার স্বাভাবিক ব্যবহার হলেও লেখক এতে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য যুক্ত করে এক গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রিক নাট্যের কোরাসের মতো কমলকুমার কখনো কখনো লেখকস্বরেই গল্পে প্রবেশ করেন, যা বাংলা ছোটগল্পে তুলনামূলকভাবে বিরল। যেমন—

"শুনেছি শেষটা এমনিভাবে হয়।"[২১]

"এইভাবে শেষ হয়েছে শুনি।"[২২]

এই ধরনের হঠাৎ উপস্থিতি কেবল কাহিনির গতি পরিবর্তন করে না, বরং একটি মেটাফিকশনাল চেতনা এনে দেয়, যেখানে পাঠক বুঝে ফেলেন যে, কাহিনি কেবল বাস্তবতার প্রতিবিম্ব নয়, বরং তা শিল্পসিদ্ধ নির্মাণও বটে। সবমিলিয়ে বলা যায়, '*জল*' ও '*তেইশ*' গল্পে ভাষা হয়ে উঠেছে আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম, প্রতিবাদের সম্ভাব্য পরিসর এবং পরাজয়ের দলিল। চরিত্ররা সরল কিন্তু এই সরলতাই একধরনের অস্তিত্বজিজ্ঞাসার সূচনা করে। তারা সাধারণ নন, অতীব গ্রাম্য, অতীব অবহেলিত আর এই উপেক্ষিত মানুষগুলোই কমলবাবুর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তাদের ভাষা, অভিব্যক্তি, যন্ত্রণা ও আত্মসমর্পণকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তর করেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গি নির্মাণ করেন।

কমলকুমার মজুমদারের গল্পসাহিত্যে একটি সুস্পষ্ট অন্বয় দেখা যায়, তাঁর আদর্শ মানুষ (Ideal Man) অন্বেষণের মধ্য দিয়ে ভাষার ভঙ্গি, শিল্পরীতি এবং সমাজদর্শন ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়েছে। মালার্মের মতো যাঁর শিল্পদৃষ্টি ছিল কবিতাকে সংগীতের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার দিকে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'ভাবের স্বাধীন লোক' রূপে নন্দনচিন্তার প্রকাশ; তাঁদের উত্তরসূরী হয়েও কমলকুমারের অনুসন্ধান ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক আদর্শ মানবকে নির্মাণ করতে, যে জীবনের দুঃসহ বাস্তবতায় থেকেও একটি গভীর আত্মিক বিশুদ্ধতা ধারণ করে। এই ভাবনার প্রতিফলন তাঁর গল্পভাষায় যেমন ঘটেছে, তেমনই ঘটেছে চরিত্রচিত্রণে।

'*মধু*', '*লাল জুতো*', '*জল*', '*তেইশ*' গল্পে সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের চিত্রিত করার পর, '**মল্লিকা বাহার**'-এ এসে লেখক এক নতুন ধাপে উত্তীর্ণ হন। এখানে তিনি কেবল সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চরিত্র নির্মাণ করেননি; বরং এক ধরণের control reversal ঘটে। তিনি নিজেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় প্রবেশ করেন এবং সমাজ, ভাষা ও চরিত্র; তিনটিকে জটিলভাবে প্রক্ষেপণ করেন এক সুনির্মিত শিল্পরীতিতে।

'মল্লিকা বাহার' গল্পে কমলবাবুর শিল্পদৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- Analytical Cubism বা বিশ্লেষণাত্মক কিউবিজমের প্রয়োগ। এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছেন-

"আমি ঠিক এনালিটিক কিউবিজমের পক্ষপাতী এবং আমি শ্লেষ ব্যঙ্গ লিখতে কষ্ট পাই..."[২৩]

এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, তিনি বাস্তবতা বা আবেগকে সরলরৈখিকভাবে উপস্থাপন করতে চাননি। বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটিকে দেখানো, সময় ও অনুভবকে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করা তাঁর কৌশল। ফলে গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি অতীত, বর্তমান ও অন্তরঙ্গ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত; সব একসাথে এসে যায়। মল্লিকার ঘর, আয়না, চিঠি, সব একত্রে একটি অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের ফ্রেম গড়ে তোলে।

গল্পের শুরুর এই আয়নাকেন্দ্রিক দৃশ্য একটি দার্শনিক টানাপড়েন তুলে ধরে:

"মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়ে।"[২৪]

এই বাক্যে প্রশ্ন ওঠে, মল্লিকা কি নিজেকে দেখে, না কি নিজেই একটি প্রতিবিম্বমাত্র? এটি একটি অস্তিত্বগত সংকট, যা 'হতে চাওয়া' ও 'হতে বাধ্য হওয়া'- এই দুইয়ের সংঘাত। সে নিজের চাওয়া এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির চাপে পিষ্ট এক আত্মার দ্বন্দ্বে আটকে যায়। এই দ্বন্দ্বের একটি গভীর দিক হলো, নারীর নিজস্বতা বনাম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। মল্লিকার দায়িত্ব নিতে হবে বার্ধক্যপীড়িত পিতামাতার, অথচ এই দায়িত্ব গ্রহণকে কেউ আর তার সম্মান মনে করছে না। তাকে সমাজের চোখে "চাকরে" হতে হবে-

"আইবুড়ো মেয়ে থাকবে না কখনই, চাকরে হবে।"[২৫]

এই সংলাপের ভেতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীর শ্রম, ভালোবাসা, আত্মত্যাগের বিনিময়ে সে কী পায়; অসম্মান ও অবজ্ঞা। এই ক্ষোভ সমাজের প্রতিই নয়, নারীর নিজের অস্তিত্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিও।

গল্পের আরও একটি বিশেষ দিক হলো নারী-নারী সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যা। মল্লিকা ও শোভনার সম্পর্ককে লেখক কেবল যৌনতার নিরিখে দেখাননি। এটি একধরনের মুক্তির রূপ; সামাজিক চাপ থেকে, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং নিজস্ব মানসিক ক্লান্তি থেকে।

> "মল্লিকা, শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে টুকরো।"[২৬]

এই চুড়িভাঙা এক প্রতীকী মুক্তি; সমাজসংস্কার, যৌন পরিচয়ের বিধিনিষেধ এবং নারীর প্রতি সামাজিক সহানুভূতির সীমাবদ্ধতা, সব কিছুর বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত প্রতিবাদ। এটি যেন পৌরাণিক 'মুক্তি লাভ'-এর এক নারীবাদী পুনরাবৃত্তি। কমলকুমার তাঁর ভাষা ও চরিত্র নির্মাণে সচেতনভাবে বিদ্রোহের মনোভাব দেখিয়েছেন, কিন্তু তা কখনও একরৈখিক নয়। তিনি প্রতীক, প্রতিফলন ও প্রতিজ্ঞার ভেতর দিয়ে তা ব্যক্ত করেছেন। মল্লিকার একতরফা ভালোবাসা ব্রজের প্রতি, যা সমাজ অবজ্ঞা করে, যা তুচ্ছ হয়। এইসব অনুভবকে লেখক এক সহমর্মী, অন্তর্জাগতিক গভীরতায় তুলে ধরেন।

> "যে তার এত বুকভরা ভালবাসা তা অযথাই হয়, আগামীকাল থেকে আর কেউ, একথাই যে, তাকে আর তেমন ভাবে দেখবে না।"[২৭]

এই বেদনা শুধু মল্লিকার নয়, সমাজে প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত সেইসব নারীদেরও, যারা সংসারের দায় কাঁধে নেয়, প্রেমের বেদনায় জর্জরিত হয়, অথচ কারও চোখে সম্মান পায় না। 'মল্লিকা বাহার' গল্পে সেইসব স্তব্ধ আত্মাদেরই কমলবাবু দিয়েছেন ভাষা, প্রতিবিম্ব, ও প্রতিরোধের আকার। কমলকুমার মজুমদারের *'মল্লিকা বাহার'* গল্পে যে নারীবিশ্ব গঠিত হয়েছে তা শুধুই সামাজিক নিপীড়নের বাস্তবতা নয়, বরং নারীর নিজস্ব অস্তিত্ব, পরিচয়ের দ্বন্দ্ব ও তার সামাজিক 'অভিনয়'কে (performance) নিয়েও প্রশ্ন তোলে। এই দিক থেকে Judith Butler-এর Gender Performativity তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

জুডিথ বাটলার তাঁর বই *Gender Trouble* (1990)-এ বলেন-

> "There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very 'expressions' that are said to be its results."[২৮]

অর্থাৎ, লিঙ্গ কোনো জন্মগত বা মৌলিক পরিচয় নয়, বরং তা সামাজিকভাবে গঠিত, বারবার পুনরাবৃত্ত 'অভিনয়'-এর মাধ্যমে সমাজে গৃহীত হয়ে ওঠে। নারীর 'নারীত্ব' বা পুরুষের 'পুরুষত্ব' এই পরিচয়গুলো মূলত সামাজিক বিধিবদ্ধ আচরণ, ভাষা, অভিব্যক্তি ও নিয়মের মধ্য দিয়ে গঠিত। কমলকুমার এই ধারণাকে অস্পষ্টভাবে হলেও শিল্পরূপ দিয়েছেন *'মল্লিকা বাহার'* গল্পে। মল্লিকার চরিত্রটি প্রতিনিয়ত সমাজ দ্বারা নির্ধারিত নারী-অভিনয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন; যেখানে তাকে 'চাকরে' হতে হবে, কুমারী রূপে থাকতে পারবে না, পুরুষতান্ত্রিক সংসারধর্ম পালন করতে হবে, এবং তার ভালোবাসা বা চাওয়া মূল্যহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু এই সমাজনির্ধারিত ভূমিকার সঙ্গে তার আত্মপরিচয়ের এক ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটছে।

এই সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত মেলে আয়না প্রসঙ্গে—

> "মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়ে।"[২৯]

এই বাক্যে একটি মারাত্মক অস্তিত্ববাদী দ্বন্দ্ব উন্মোচিত হয়- মল্লিকা কি নিজে 'হচ্ছে' নাকি সমাজের প্রতিফলিত কল্পনার প্রতিচ্ছবি মাত্র? Butler-এর ভাষায়, identity is never self-originating, বরং তা সর্বদা প্রেক্ষিতনির্ভর, সামাজিকভাবে পারফর্ম করা হয়। আরও প্রাসঙ্গিক হলো শোভনা ও মল্লিকার সম্পর্ক, যা কেবল সমকামিতার ইঙ্গিত নয়, বরং অন্যতর এক মুক্তির অভিব্যক্তি। নারীত্বকে সমাজ যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে—তার বাইরের এক সম্পর্ক, এক সংযোগ, এক বিশ্বাস গড়ে তোলা হচ্ছে এখানে। চুড়ি ভাঙার প্রতীকী দৃশ্যটি তাই 'জেন্ডার' এর সামাজিক বন্দিত্ব থেকে মুক্তিরও ইঙ্গিত বহন করে:

> "মল্লিকা, শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে নিজের কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো।"[৩০]

চুড়ি যা একটি সাংস্কৃতিকভাবে নারী-পরিচয়ের প্রতীক। সেটি ভেঙে ফেলা মানে নারীর পারফর্ম করা রোল (যেমন: কুমারী, স্ত্রীরূপে গ্রহণযোগ্য, আত্মত্যাগী ইত্যাদি) প্রত্যাখ্যান করা। এটি একটি gender insubordination, যা Butler-এর মতে, "gender trouble" সৃষ্টি করে। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিদ্রোহ নয়, বরং সাংস্কৃতিক কোড ভাঙারও প্রক্রিয়া।

এছাড়াও, গল্পজুড়ে কমলকুমার নারীর যে বেদনা, ক্লান্তি ও সামাজিক রোল পালনের চাপ দেখিয়েছেন, তা ঠিক Butler-এর ধারণার মতোই "নিয়মিত পারফরম্যান্স"-এর ফল, যা মানবমন ও সমাজ-সম্পর্কের গভীরে ছাপ ফেলে। 'মল্লিকা বাহার' গল্পটি নারীর সামাজিক ভূমিকা ও আত্মপরিচয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে Judith Butler-এর gender performativity তত্ত্বের একটি সাহিত্যিক প্রতিফলন হিসেবে পাঠযোগ্য। এখানে নারীত্ব কোনো অপরিবর্তনীয় সত্তা নয়, বরং সামাজিক চাহিদার এক অভিনয়, যা ভাঙা, পাল্টানো ও প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কমলকুমারের লেখায় এই প্রতিরোধ একটি প্রতীকী মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, যা কেবল সাহিত্য নয়, সমাজতত্ত্ব ও লিঙ্গ-চেতনার আলোচনাতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যকর্মে ভাষা কেবল কাহিনিবাহী উপাদান নয়, বরং একটি স্বাধীন চরিত্র, একটি জ্যান্ত অস্তিত্ব। বিশেষত *'মল্লিকা বাহার'* গল্পে লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি তাঁর আদর্শ মানব ও শুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদের অনুসন্ধানের পরিপূরক হয়ে ওঠে। এই গল্পে ভাষার গঠন, শব্দচয়ন ও বাক্যপ্রবাহে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তা শুধু শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রয়াস নয়, বরং লেখকের দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানের পরিচায়ক। এই গল্পের ভাষা প্রধানত চলিত রীতি, কিন্তু তার ভেতরেই রয়েছে তৎসম শব্দের আধিক্য, ইংরেজি বাক্যরীতির ছাপ, এবং ছোট ছোট বাক্য ও দীর্ঘ সংবেদী বাক্যের বিপরীত মিশেল। ফলে গল্পের ভাষা যেমন বাস্তবতার অনুভূতিকে ধারণ করে, তেমনি একটি রহস্যময় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকেও প্রকাশ করে। এমনকি ভাষার এই দ্বৈততা কখনও কখনও একটি চরিত্রে পরিণত হয়, যা গল্পকে বহুমাত্রিক করে তোলে।
একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য:

> "শূন্য ছাদ, চারকোণা চারকোণা এক অনুভব; উপরে আকাশে রাত্রি, তদূর্ধ্বে শ্যাম নীলিমাই। মল্লিকার সমস্ত ক্লান্তিটা অথবা যে যাকে এতবৎ আপশোস বলা হয়, ক্রমে এখন এই প্রতীয়মান যে যে তার আর নাই।"[৩১]

এই বর্ণনায়, ভাষার চিত্রকল্প, পুনরুক্ত শব্দবন্ধ (চারকোণা চারকোণা), ও দার্শনিক বোধের সঙ্গে গাঁথা বাক্যসন্ধির মাধ্যমে একপ্রকার ভাষাময় ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। এখানে ভাষা কেবল দৃশ্য নির্মাণ করছে না, বরং অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে প্রতিসমান্তরাল বর্ণনার ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করছে। কমলকুমার ভাষাকে অলংকরণে ভারাক্রান্ত করেননি। তাঁর ভাষায় অলংকারের সংখ্যা কম, কিন্তু তাতে প্রাচীনগন্ধী মায়া এবং একটি রহস্যময় পরিপার্শ্ব লুকিয়ে থাকে। লেখক বরং ভাষার জটিলতা এবং সমস্ত অনুভবকে একসাথে ধরার প্রয়াসে দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগ করেছেন, যা প্রবন্ধধর্মী রীতির সঙ্গে মিশে গেছে:

> "তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আজ প্রায় ন-দশ বছর যে অনুভব নিয়ে কাটিয়েছে সেই অনুভব সোজা ফেলে দিতে হবে, যেমন চিরুনিতে জড়ানো ছেঁড়া চুলের গতিই।"[৩২]

এই বাক্যে একদিকে আছে সরল উপমা, অন্যদিকে জটিল মানসিক কাঠামো। এখানে ভাষা হয়ে উঠেছে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সংরক্ষক। লেখক যেন আত্মজৈবনিক প্রবাহে মল্লিকার ভিতরের চিৎকার, ক্লান্তি ও আত্মত্যাগকে ভাষায় রূপান্তর করছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, কমলকুমার প্রায় প্রাবন্ধিক ভঙ্গিতে গল্প নির্মাণ করেন। তিনি আগে বিষয় নির্বাচন করেন, চরিত্র নির্ধারণ করেন, তারপরে ভাষার মাধ্যমে সেই অভিপ্রায়কে সফল করেন। এই গল্পে তিনি বিশুদ্ধ, রহস্যময়, অকপট এক মানুষের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার প্রয়োজনে ভাষায় অতিরিক্ত অথচ সচেতন প্রসারতা এনেছেন।

এছাড়া, বর্ণনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে লেখক নিজেকে কখনো কখনো এমনভাবে গল্পে ঢুকিয়ে দেন, যা পাঠককে গল্পের পরিসর থেকে দার্শনিক বা মানসিক পরিসরে স্থানান্তরিত করে। তাঁর এই শৈলী যেন চারপাশে এক দার্শনিক বেড়াজাল সৃষ্টি করে, যার ভেতর চরিত্রেরা বন্দি এবং পাঠক নিমগ্ন।

সবশেষে, বলা যায় *'মল্লিকা বাহার'* গল্পে ভাষা এবং বর্ণনা একটি স্বতন্ত্র কাঠামো নির্মাণ করেছে, যা কমলকুমারের 'আদর্শ মানব' দর্শনের ভাষিক সমান্তরাল। ভাষার গঠন ও ব্যবহারে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা বাংলা গল্পের গতানুগতিক ভাষাবিন্যাস ভেঙে একটি শিল্পসম্মত বিপরীতরীতির জন্ম দিয়েছে।

কমলকুমার মজুমদারের আরেকটি গল্প '*মতিলাল পাদরী'* গল্পটি তাঁর সাহিত্যিক ভাষার প্রবণতা ও বর্ণনাভঙ্গির একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন। *'মল্লিকা বাহার'* থেকে *'মতিলাল পাদরী'* গল্পে তিনি ভাষার জটিলতা থেকে ধীরে ধীরে সরলতার দিকে এগিয়েছেন। যদিও সূচনালগ্নে কয়েকটি পরিচ্ছেদ বিমূর্ত ও দার্শনিক চিন্তায় আচ্ছন্ন, চরিত্রের আগমনের পর গল্পটি হয়ে ওঠে আরও মানবিক ও সহজবোধ্য। এ প্রবণতা তাঁর অন্যান্য গল্পেও পরিলক্ষিত হয়, চরিত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সরল হয়ে ওঠে এবং পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। গল্পে মতিলাল পাদরীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখক একটি গভীর ধর্মতাত্ত্বিক ও মানবিক অন্বেষণ উপস্থিত করেন। মতিলাল মনে প্রাণে খ্রিস্টান হতে চান, তবে তা অনুশাসনের অনুশীলন নয়, বরং এক ধরনের প্রেমানুভবের মধ্য দিয়ে। তাঁর মুখে উচ্চারিত-

> "শুধুমাত্র একটি আশা, পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান। পুরো ক্রিশ্চান বলতে অর্থাৎ কথাটার মধ্যে বহু পুরাতন প্রেমের অনুভব ছিল, অনুতাপ নয়।"[৩৩]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, তাঁর ধর্মচর্চা অনুশোচনার নয়, বরং এক গভীর প্রেমময় আত্মসম্পর্কে নিবেদিত। কমলকুমার এখানে ধর্মের কাঠামোগত রূপের চেয়ে মানবিক সম্পর্ক ও অনুভূতির দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'মানুষের ঊর্ধ্বে কিছু নেই'- এই বৌদ্ধিক মানবতাবাদের এক উদাহরণ। গল্পে এক ঝোড়ো রাতে সন্তানসম্ভবা ভামোর নামের এক নারী আসে গির্জায়। মতিলাল তাকে আশ্রয় দেন, এবং এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। শিশুর কান্না ঝড়কে থামিয়ে দেয়, আর পাদরীর মনে জাগে অভিভূতির অনুভব।

"বিশাল অজর প্রকৃতিকে ভীত করতেও চাইছে, আর রোমাঞ্চিত পাদরী কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছেন।"[৩৪]

এই সন্তানকে কেন্দ্র করে মতিলাল ঈশ্বরীয় আবেগে উদ্বেলিত হন। বাস্তবে নিঃসন্তান কমলকুমার হয়তো এই গল্পে তাঁর নিজস্ব পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করেছেন। বদনের মুখে উচ্চারিত-

> "বাবা এখন আশীর্বাদ কর, আসছে জন্মে যেন বাপ হতে পারি।"[৩৫]

Judith Butler-এর *gender performativity* তত্ত্বের আলোকে একে 'paternal performativity' বলা যেতে পারে- জৈবিক ভাবে নয়, সামাজিক ও আবেগিক প্রক্রিয়ায় মতিলাল একজন 'পিতা' হয়ে ওঠেন। গল্পের ক্লাইম্যাক্সে মতিলাল নিজের স্বীকারোক্তিতে বলেন—

> "আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ।"[৩৬]

অথচ সেই তিনি প্রেম দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, ঈশ্বরতুল্য স্নেহ বিলিয়েছেন। এই আত্মস্বীকারের মধ্য দিয়েই লেখক মানুষের মধ্যকার ঈশ্বরত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধর্মীয় রূপ বা লেবেল নয়, মানুষের প্রতি মানবিক আচরণই তাঁর কাছে আসল। মতিলালের এই মনোভঙ্গিই তাঁকে খ্রিস্টের সমকক্ষ করে তোলে। ধর্মীয় রূপ নয়, বিশ্বাস আর প্রেমের আন্তর সম্পর্কই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'মতিলাল পাদরী' গল্পে ভাষার বহুমাত্রিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংলাপে ব্যবহার হয়েছে সাঁওতাল অঞ্চলের লোকজ ভাষা, যেমন-

> "ফুলল চোখ বড় করে বললে, 'তবে মাগী বিয়োবে নাকি- বিয়োচ্ছে নাকি পাদরী বাবা?"[৩৭]

আবার লেখকের বর্ণনারীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে তৎসম শব্দ ও দার্শনিক জটিলতা-

> "মাংসল বীজ বিদীর্ণ করে ফেটে ছিঁড়ে, অন্ধকার বিরোধী একটি হাতিয়ার আসছে।"[৩৮]

এই বিপরীতধর্মী ভাষার সহাবস্থান গল্পটিকে দেয় এক ধরনের ভাষিক গভীরতা ও বৈচিত্র্য। পাঠককে একদিকে এনে ফেলে বাস্তবিক লোকজ দুনিয়ায়, অপরদিকে নিয়ে যায় বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতায়। তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন-

> "কথাবীজকে উপেক্ষা না করেও কমলকুমার বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ভাববীজের বহুস্বরিক উপস্থাপনায়।"[৩৯]

কমলকুমারের গল্পে ভাষা কেবল মাধ্যম নয়, বরং এক 'শরীরী অভিজ্ঞতা'। তাঁর বাক্যগঠন চিত্রকল্পময়, অলংকারহীন হয়েও কাব্যিক। এই গল্পে আমরা ভাষার মাধ্যমে অনুভব করি জন্ম, মাতৃত্ব, প্রেম, আতঙ্ক ও মুক্তি; সবই যেন স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে ভাষার শরীরের মধ্য দিয়ে। *'মতিলাল পাদরী'* গল্পে কমলকুমার ধর্মীয় অনুশাসনের সীমা ভেঙে মানুষের নিজস্ব অনুভব ও মানবিকতার মধ্যেই সত্যকে খুঁজেছেন। চরিত্র ও ভাষার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গল্পটি ক্রমশ এক আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে উপনীত হয়। মতিলাল পাদরী যেভাবে সামাজিকভাবে এক পিতার ভূমিকা গ্রহণ করেন, যে প্রেম ও দায়িত্ব তিনি পালন করেন, তা তাঁকে খ্রিস্টীয় চরিত্রেরও ঊর্ধ্বে এক মানবিক আদর্শে পৌঁছে দেয়। এই গল্প তাঁর অন্য রচনার তুলনায় বেশি বাস্তবমুখী, এবং একইসঙ্গে দার্শনিক; যেখানে ঈশ্বর নয়, মানুষই শেষ সত্য।

কমলকুমার মজুমদারের এই পর্যায়ের ছয়টি গল্পে বিষয়ের বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি বাংলা ছোটগল্পে তাঁর নিজস্ব এক অনন্য রূপ ও ভাষাশৈলীর উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। তাঁর গদ্য ক্রমান্বয়ে জটিল ও মননশীল হলেও, এতে মূলে রয়েছে আদিম সাদাসিধে সরলতার আকাঙ্ক্ষা এবং এক রহস্যময় সবুজ প্রদেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ। তাঁর চরিত্রগুলো সরল ও আদিম প্রকৃতির হলেও, তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও পথ নির্বাচনের জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করে, যা মানবিক বোধের গভীরে নিহিত। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যভাষা, মনস্তত্ত্ব ও সমাজবীক্ষণ বাংলা কথাসাহিত্যের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। Freud-এর লিবিডো তত্ত্ব কিংবা Judith Butler-এর gender performativity-এর আলোকে তাঁর চরিত্র ও ভাষার গভীর বিশ্লেষণ আমাদের একাধিক স্তরে ভাবতে বাধ্য করে। তাঁর গল্পে প্রেম, যৌনতা, আত্মপরিচয়, শ্রেণি ও লিঙ্গবৈষম্য এবং প্রান্তিক জীবনের যন্ত্রণার এমন গভীর ও দার্শনিক রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর লেখনীতে ভাষা কেবল ভাবপ্রকাশের মাধ্যম নয়; ভাষা নিজেই এক শিল্পসত্তা, যা পাঠককে অনির্বচনীয় বোধ, দ্বন্দ্ব ও ভাবনায় নিমজ্জিত করে। বিশেষত নারীর মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিদ্রোহী কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠা করে। এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, কমলকুমার কেবল বিষয়বৈচিত্র্যে নয়, ভাষার নির্মাণশৈলীতেও চূড়ান্ত আধুনিক ও মননশীল। তাঁর সাহিত্য আমাদের শেখায়, ভাষা কেবল শব্দ নয়, ভাষা এক অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও লিঙ্গভিত্তিক পাঠের প্রসারে কমলকুমার মজুমদার হতে পারেন এক গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক। তাঁর গল্প কেবল পাঠ্য নয়, ভাবনারও অনিবার্য ক্ষেত্র।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সতজিৎ। সাক্ষাৎকার, কবিতীর্থ, (উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত)। ৯২তম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ: ১৮১।
২. রায়, সতজিৎ। কমলবাবু, কমলকুমার: সৃষ্টিবৈচিত্র্যের খোঁজে, (শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। প্রকাশ ভবন, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ: ২৮।
৩. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ২১-২২।
৪. তদেব, পৃ: ২২।
৫. তদেব, পৃ: ২২।
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। কমলকুমার মজুমদার গল্পসমগ্র, ভূমিকাংশ। আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ: ১০।
৭. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ২১-২২।
৮. তদেব, পৃ: ২২।
৯. তদেব, পৃ: ৩২।
১০. তদেব, পৃ: ৩০।
১১. তদেব, পৃ: ৩৫।
১২. তদেব, পৃ: ৪২।
১৩. রায়, দেবেশ। তেইশ বছর আগে-পরে, কমলকুমার: সৃষ্টিবৈচিত্র্যের খোঁজে, (শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) । প্রকাশ ভবন, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ: ১১৪।

১৪. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ৪৪।
১৫. তদেব, পৃ: ৫৪।
১৬. তদেব, পৃ: ৫৭।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব। কমলকুমার, কলকাতা পিছুটানের ইতিহাস। আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৫, কলকাতা, পৃ: ২২।
১৮. সরকার, আলোক। কমলকুমার মজুমদারের মানুষ ও ভাষা, *কবিতীর্থ,* (উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত) । ৯২তম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ: ৭৯।
১৯. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ৪৩।
২০. তদেব, পৃ: ৪৭।
২১. তদেব, পৃ: ৪৫।
২২. তদেব, পৃ: ৪৪।
২৩. মজুমদার, কমলকুমার। বিভাব (কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা), [সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত] । ১৪১০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা-৬৮, পৃ: ৬৮।
২৪. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ৫৮।
২৫. তদেব, পৃ: ৫৯।
২৬. তদেব, পৃ: ৬৫।
২৭. তদেব, পৃ: ৫৯।
২৮. Buttler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. 10th anniversary edition, Routledge, Newyork, 2002, P. 33.
২৯. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ৫৮।
৩০. তদেব, পৃ: ৬৫।
৩১. তদেব, পৃ: ৬৫।
৩২. তদেব, পৃ: ৫৯।
৩৩. তদেব, পৃ: ৬৭।
৩৪. তদেব, পৃ: ৭০।
৩৫. তদেব, পৃ: ৭৬।
৩৬. তদেব, পৃ: ৮৩।
৩৭. তদেব, পৃ: ৬৯।
৩৮. তদেব, পৃ: ৬৮।
৩৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর। কমলকুমার: অনন্য শিল্পভাষা, *কবিতীর্থ,* (উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত) । ৯২তম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ: ১০৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) । আনন্দ, দশম সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা।
২. মুখোপাধ্যায়, শুভ, সম্পাদনা। কমলকুমার: সৃষ্টিবৈচিত্র্যের খোঁজে । প্রকাশ ভবন, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা।